Jahangirnagar University Journal of Journalism and Media Studies
Vol 2 • 2016 • ISSN 2409-479X

মীর মশাররফ হোসেনের সাংবাদিক সত্তা

খন্দকার শামীম আহমেদ*

সার-সংক্ষেপ: মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলমান সাহিত্যিক, যিনি আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। *বিষাদ-সিন্ধু*, *জমিদার দর্পণ*–প্রণেতা হিসেবেই তিনি সাধারণ পাঠকের কাছে খ্যাতিমান। *রত্নবতী*, *বসন্তকুমারী নাটক*, *সঙ্গীত লহরী* প্রভৃতিতে তাঁর বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। *গোজীবন*, *উদাসীন পথিকের মনের কথা* প্রভৃতি রচনায় তাঁকে সমাজসচেতন সাহিত্যিক হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি দুটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন– *আজিজননেহার* ও *হিতকরী*। সিপাহি বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, ওহাবি-ফরায়েজি আন্দোলন, জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের জন্ম, বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন প্রভৃতি তাঁর জীবদ্দশাতেই ঘটেছে। বাঙালি মুসলমাদের মাতৃভূমি চেতনার সংকট ও সংশয়, সমাজের নানাবিধ সমস্যা, রাজনৈতিক শত্রু-মিত্র নির্ণয়ে সংশয়ের সেই যুগে মীর মশাররফ হোসেন পত্রিকার পাতায় অনেক সাহসিকতার সঙ্গে লিখেছেন। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, ঘুষ বা উৎকোচ, তরুণের নেশাক্রান্ত হওয়া, কুষ্টরোগিদের দুরবস্থা, বাল্যবিবাহ, শিক্ষা ব্যবস্থা, পুলিশের অত্যাচার– প্রভৃতি বিষয়েও এই সাহিত্যিক-সম্পাদকের কলম নিরলস চলেছে। মীর মশাররফ হোসেনের সাংবাদিক সত্তার স্বরূপ অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

মীর মশাররফ হোসেনের সাংবাদিকতার হাতে খড়ি হয় *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকার মাধ্যমে।[১] 'আমার জীবনী'তে তিনি লিখেছেন: "...রাত্র প্রভাত হইল, প্রভাকরে এক প্রবন্ধ লিখিলাম। মুসলমানের বিবাহ পদ্ধতি ... মনের কথা যাহা মনে উদয় হইল; যেরূপ বিবাহ হইয়া থাকে তাহারই দোষ ধরিয়া যথাসাধ্য লিখিলাম। আজ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিলাম, মনের কথা কিনা? মনে বড়ই লাগিল। লিখিয়া ডাকে রওয়ানা করিলাম।"[২] তিনি আরও লিখেছেন :

* **ড. খন্দকার শামীম আহমেদ:** সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

> কলিকাতার সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত। সহকারী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সহিত পত্রে পত্রে দেখাশুনা যেরূপ হইতে পারে তাহা আছে। আমি অনেক সংবাদ তাঁহাদের কাগজে লিখিতাম। তাঁহারাও দয়া করে ছাপাইতেন। আমাকে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন-"আমাদের কুষ্টিয়ার সংবাদদাতা"। কেউ জানিত না যে আমি প্রভাকর পত্রিকায় কুষ্টিয়ার সংবাদদাতা সাদাসিদেভাবে সংবাদ লিখিতাম। ভুবনবাবু কাটিয়া ছাটিয়া প্রকাশের উপযুক্ত করিয়া দিতেন। কোন কোন সংবাদ বাদও দিতেন। সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া পাঠাইতাম। কুমারখালীতে সে সময়ে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা প্রকাশ হইত। কুমারখালী, আমার বাটী হইতে নিকটে। গ্রামবার্ত্তা সম্পাদক বাবু হরিনাথ মজুমদার মহাশয় আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। আমিও তাহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মান্য করিতাম। সপ্তাহে সপ্তাহে গ্রামবার্ত্তায় সংবাদ লিখিতাম। প্রভাকরেও লিখিতাম। মক্তারপুর বসিয়া বসিয়া থাকি কোন কাজকর্ম নাই। সংবাদ সংগ্রহ করিয়া নিয়মিতরূপে লিখিতে আরম্ভ করিলাম। হরিনাথবাবু কপতক্ষ নদীর অবস্থা লিখিতে পত্র লিখিলেন, এক একদিন বহুদূর নৌকা করিয়া আসিয়া লিখিতাম। তিনি কাটিয়া ছাঁটিয়া কাগজে প্রকাশ করিতেন। এদিকে হরিনাথবাবু আর কলিকাতার দিকে ভুবনবাবু আমার সামান্য লিখা সংশোধন করিয়া প্রভাকরে প্রকাশ করা আরম্ভ করিলেন।[৩]

সাংবাদিক-মশাররফের স্বীকারোক্তি হিসেবে এই উদ্ধৃতির মূল্য অনেক। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান গদ্য শিল্পীদের অন্যতম মীর মশাররফ হোসেন পত্রিকায় লিখে হাত পাকিয়েছেন। 'মুসলমানের বিবাহ পদ্ধতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি *সংবাদ প্রভাকর*-এ প্রকাশিত হয় মে, ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে।[৪] কাঙ্গাল হরিনাথের *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকায়* মীর মশাররফ হোসেন লিখতেন। মীর মশাররফ হোসেন সাংবাদিকতাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন। 'বিবি কুলসুমের অপ্রকাশিত রোজনামচা' থেকে জানা যায় বিবি কুলসুম যখন রোগে শয্যাশায়ী তখনও মশাররফ প্রেসে যাচ্ছেন। কুলসুমের জবানীতে এর সাক্ষ্য পাওয়া যায় : "বৃহস্পতিবারের দিনগত রাতে আমার শামী [স্বামী] ... রাত্র যখন ২টা বাযে[বাজে] সেই সময় আসিলেন। তখন আমার হাপের পিড়া অত্ন্যাত [অত্যন্ত] তাড়াতাড়ি আমার শামী আমার গায়ে বাতাস দিতে আরাম্ভ করিলেন [।] ... রাত্র ভোর হইল। আমার প্রাণ একবার সমস্ত দিনের মত ঠাণ্ডা হইল। মীর সাহেব... প্রেচে [প্রেসে] গেলেন। বেলা যখন ১১টা বাযে সেই সময় ঘরে আসিলেন।"[৫] এই উদাহরণগুলো মীর মশাররফ হোসেনকে সাংবাদিক, সম্পাদক হিসেবে চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। মীর মশাররফ হোসেনের সম্পাদনায় দুটি পত্রিকা বের হয়েছিল। একটি *আজীজন নেহার* অপরটি *হিতকরী*।

আজীজন নেহার :

সাময়িকপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে মীর মশাররফ হোসেনের অন্যতম কীর্তি *আজীজন নেহার* নামক 'মাসিক' পত্রটি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *আজীজন নেহার* সম্পর্কে লেখেন : "মশাররফ হোসেন কিছু দিন একখানি মাসিকপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন; ইহা- "আজীজন নেহার"। হুগলী কলেজের মুসলমান ছাত্রবর্গ এই পত্রিকা প্রচারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল– বৈশাখ ১২৮১ (এপ্রিল ১৮৭৪)।"[৬] *আজীজন নেহার* পত্রিকার আগমনের খবর 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১ মে সংখ্যায় পাওয়া যায়। "শ্রীপু" ছদ্মনামের আড়ালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুজ, *মধুমতী*র লেখক পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২২) *আজীজন নেহার* সম্পর্কে লেখেন–

> আজীজন নেহার।– উক্ত শীর্ষক একখানি মাসিক সংবাদপত্র প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে; ...আমি আজীজন নেহার কে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছি। এই পত্রিকা কয়েকজন মুসলমান যুবকের লেখনীবিনির্মুক্ত সরল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। দেখুন, যে মুসলমানদিগের নিমিত্ত ভারতের অনেক অংশে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষা পুনর্ব্বার আত্যন্তিক প্রভায় উদিত হইয়াছে। যাহাদের জন্য অত্যল্পকাল স্বদেশ-প্রতি-নিবৃত্ত ক্যাম্বেল বাহাদুর সুমিষ্ট, সরল, সংস্কৃতালকৃত আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার পরিবর্ত্তে শ্রুতিকঠোর হিন্দি-পারসী-কলঙ্কিত আদালতী বাঙ্গালার প্রচলন বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টিত ছিলেন, দেখুন সেই ক্যাম্বেলপ্রিয় মহম্মদীয়গণ মধুময় বাঙ্গালা ভাষার যথার্থ স্বাদগ্রহণে কেমন সমর্থ হইয়াছেন।[৭]

সাপ্তাহিক 'এডুকেশন গেজেটে'র[৮] ৮ মে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ সংখ্যায় *আজীজন নেহার* সম্পর্কে বলা হয়–

> আমরা সম্প্রতি দুইখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। একখানির নাম ন্যাশনেল বাজট ... অপরখানির নাম আজীজন নেহার। হুগলী কলেজের কতিপয় মুসলমান যুবক ইহার প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার মূল্যের ও প্রচারের সময়েরও এখন নিরূপণ হয় নাই। প্রচারকগণ লিখিয়াছেন 'এবারে মূল্যের কিছুই নির্ণয় করা গেল না। পাঠকগণের উৎসাহসূচক পত্রিকা ও গ্রাহকগণের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিলেই আগামী মাস হইতে পাক্ষিকরূপে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল'। এই পত্রিকাখানির বিশেষ বিশেষ বক্তব্য এই, এখানি মুসলমানের লিখিত, অথচ ইহাতে মুসলমানি বাঙ্গালার নামগন্ধ নাই, বিশুদ্ধ বাঙ্গালার রীতিতে লিখিত। লেখকেরা উৎসাহ পাইবার যোগ্য, তাহার সন্দেহ নাই। আমরা উভয় পত্রিকারই মঙ্গলকামনা করি।[৯]

আজীজন নেহার পত্রিকার প্রকাশকাল বৈশাখ ১২৮১ সাল/ এপ্রিল ১৮৭৪ খ্রি. নির্দেশ করলেও, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকা প্রকাশের দিনটির কথা উল্লেখ

করেননি। এ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায় মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে[১০]। মশাররফ হোসেন লিখেছেন : "মাতামহীর স্বর্গারোহনের পর ১২৮১ সালের ১লা বৈশাখ "আজীজাননাহার" নামে বাংলা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিলাম। মুসলমান সমাজে এই বাংলা পত্রিকা বঙ্গদেশে প্রথম প্রকাশিত হইল।"[১১] এই বক্তব্য থেকে মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত *আজীজন নেহার* পত্রিকার প্রকাশকাল স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়– ১লা বৈশাখ ১২৮১।

আজীজন নেহার প্রকাশ করা মীর মশাররফ হোসেনের পক্ষে একপ্রকার চ্যালেঞ্জ ছিল। কারণ তখন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় মুসলমান সম্পাদিত কোন পত্রিকা ছিল না। পত্রিকা প্রকাশের ঝক্কি ঝামেলাও কম ছিলনা। মীর মশাররফ হোসেন এ প্রসঙ্গে বলেন–"বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ জানিত না, বুঝিত না যে সংবাদপত্র কি? প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইলে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। ঘরের পয়সা খরচ করিয়া পরের ঘরে এরূপ খবরের কাগজ পাঠালে লাভ কি? সকল কথাই কি সত্য লিখা হয়? এত খবর পায় কোথা? যাহা হউক যিনি যাহা বলিতে লাগিলেন কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম। মনকে দৃঢ় করিলাম। বিচলিত হইব না। যাহা সংকল্প তাহাই স্থির।"[১২]

আজীজন নেহার পত্রিকার নামকরণ বিষয়ে জানা যায় মশাররফ হোসেনের 'অপ্রকাশিত আত্মজীবনী' থেকে–"প্রথম স্ত্রী আজীজননেসা। তাঁহার দুইটি পুত্র-সন্তান জ্যেষ্ঠ শরৎ, কনিষ্ঠ শিশির। এই স্ত্রীর নামেই 'আজীজাননাহার' পত্রিকা প্রকাশ করা।[১৩]

প্রথমা স্ত্রী আজীজননেসার সঙ্গে 'প্রতারণা'র মাধ্যমে (কনে বদল) বিয়ে হয় মীর মশাররফ হোসেনের। 'আমার জীবনী'তে আজীজননেসার সঙ্গে মীর মশাররফের যে দাম্পত্যজীবন অঙ্কিত, তাকে সুখী বলা যায় না। কিন্তু সেই পত্নীর নামেই পত্রিকার নামকরণ করা বিষয়ে স্বভাবতই প্রশ্নের উদ্ভব হয়। অনেক সমালোচক *আজীজন নেহার* পত্রিকার বিষয়ে নানা কাল্পনিক ঘটনার সন্নিবেশে বিভিন্ন ধরণের সমালোচনা করেছেন। যেমন: শান্তনু কায়সার তাঁর *তৃতীয় মীর* গ্রন্থে এ সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে মীর মশাররফ হোসেন প্রথম স্ত্রী আজীজন নেসাকে 'তোষামোদ' করার উপায় হিসেবে প্রকাশ করেন *আজীজন নেহার*। সমালোচকের ভাষায়–

> মীর কেন সেই স্ত্রীর নামেই পত্রিকা সম্পাদনা আর প্রকাশ করবেন? আগেই উল্লেখিত হয়েছে, বিবি কুলসুমের সঙ্গে মীরের বিয়ে হয় ১২৮০ সালের মাঘ মাসে, আর 'আজীজননেহার' প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে। মুনীর চৌধুরী স্বাভাবিকভাবে এ পত্রিকা প্রকাশের পিছনে 'দীর্ঘকালের জল্পনাকল্পনা'র এবং যে প্রেমময় 'পতিহৃদয়' ক্রিয়াশীর থাকার অনুমান করেছেন, তা সম্ভবত ঠিক নয়। যদি ওই 'পতিহৃদয়'ই পত্রিকা প্রকাশের কারণ হতো তাহলে বিবি কুলসুমের সঙ্গে বিয়েরও এত দীর্ঘকাল পরে হতো না। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়,

> কুলসুমের সঙ্গে বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই প্রথম পত্নীর নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যে আজীজননেসা পরবর্তীকালে মীরের পিতার বৈমাত্রিয় ভ্রাতা মীর সাহেব আলী আর নূরুদ্দিন ডাকাতের সাহায্যে কুলসুমকে পৃথিবী থেকে সরাবার পরামর্শ করেন, তিনি যে মীরের দ্বিতীয় বিয়েতে খুবই তিক্ত আর তীব্রভাবে আহত হয়েছিলেন (এবং সম্ভবত তা ব্যক্তও করেছিলেন), তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাহলে কি তড়িঘড়ি করে মীরের ওই পত্রিকা সম্পাদনা আর প্রকাশ প্রথম পত্নীকে উৎকোচদান কিংবা তোষামোদ করাবার উপায়মাত্র ছিল? অসম্ভব নয়।[১৪]

মীর মশাররফ হোসেন এ বিষয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন 'অপ্রকাশিত আত্মজীবনী'তে– "পত্রিকার নাম আজীজান নাহার হইবার কারণ কি? আজ পর্যন্ত নামকরণ কেহই জ্ঞাত নহেন। এখন সময় হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিলাম। 'আজীজান নাহার' অর্থাৎ 'প্রিয়দিন' এই অর্থের ভাব লইয়া পত্রিকার শিরোদেশে লিখিত ছিল : দিনপ্রিয় উপহার দিলাম যতনে/ দীনপ্রিয় হের সদা সদয় নয়নে।"[১৫]

আজীজন নেহার পত্রিকাটি কোথা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল?–এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *আজীজন নেহার* সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন (অর্থাৎ 'মীর মশাররফ হোসেন' গ্রন্থে, পুর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) তাতে প্রকাশের স্থান সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম তাঁর *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত* গ্রন্থে *আজীজন নেহার* পত্রিকার প্রকাশের স্থান হিসেবে হুগলি চুঁচুড়ার কথা উল্লেখ করেছেন : "আজীজন নেহার : মাসিকপত্র। প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১২৮১ সাল; এপ্রিল, ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ। হুগলি চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত। স্বল্পায়ু। ... সম্পাদক মীর মশাররফ হোসেন।"[১৬] মুনতাসীর মামুন *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র* (দ্বিতীয় খণ্ড) শীর্ষক গ্রন্থে *আজীজন নেহার* পত্রিকা সম্পর্কে বলেন : "'আজিজন নেহার' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন।"[১৭] একই গ্রন্থে মুনতাসীর মামুন "পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল মীর মশাররফ হোসেনের সম্পাদনায় চুঁচুড়া থেকে"[১৮] বলে উল্লেখ করেন। আবুল আহসান চৌধুরী 'মীর মশাররফ হোসেন' শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ করেন : "মশাররফের হুগলী অবস্থানকালে 'আজীজন নেহার' পত্রিকা চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত হয়।"[১৯] শামসুজ্জামান খান 'মীর মশাররফ হোসেন : নতুন তথ্যে নতুন ভাষ্যে' গ্রন্থে নতুন তথ্য দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়–

> আমরা জানি মীর 'আজীজাননাহার' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন ১২৮১ সালের পহেলা বৈশাখ তারিখে। পত্রিকাটি কিছুদিন চলেছিল বলে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় খবর দিয়েছেন। কিন্তু পত্রিকাটি কোথা থেকে বের হয়েছিল এবং কতদিন চলেছিল সে খবর কেউ দিতে পারেনি এবং পত্রিকাটি কেউ দেখেওনি। আমরাও দেখিনি। মীরের আত্মজীবনী ও হিতকরী থেকে জানা যাচ্ছে, পত্রিকা

> কুষ্টিয়া থেকেই বেরিয়েছিল। এবং পত্রিকাটি দু বছর চলে। তবে এর পরিকল্পনা মীরের মাথায় আসে হুগলীর চুঁচুড়ায় বসে।[২০]

আজীজন নেহার পত্রিকা সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক–কোন পরিচয়ে প্রকাশিত হত?– এ বিষয়ে ভিন্ন মত পাওয়া যায়। *মোসলেম হিতৈষী* পত্রিকার মে, ১৯১৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় আবদুল গোফুর সিদ্দিকীর প্রবন্ধ 'মুসলমানী সংবাদপত্রের ইতিহাস'। এই প্রবন্ধে আবদুল গোফুর সিদ্দিকী *আজীজন নেহার*কে সাপ্তাহিক হিসেবে উল্লেখ করেন। *লোকসাহিত্য পত্রিকায়* (জানুয়ারী-ডিসেম্বর ১৯৮৪) আলী আহমদ "মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত *আজীজন নেহার* পত্রিকা" শীর্ষক প্রবন্ধে *আজীজন নেহার*কে পাক্ষিক হিসেবে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এটি ছিল মাসিক পত্রিকা। মীর মশাররফ হোসেন নিজেও *আজীজন নেহার*কে কখনও পাক্ষিক আবার কখনও মাসিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক আলী আহমদ সাহেবের সৌজন্যে প্রাপ্ত "মীর মশাররফ হোসেনের নানা-বিষয়ক রাফ্‌খাতা (২ নং খাতা)"র উদ্ধৃতি দিয়ে আবুল আহসান চৌধুরী একে পাক্ষিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শামসুজ্জামান খান 'অপ্রকাশিত আত্মজীবনী'র অংশ উদ্ধৃত করে বলেন যে, "আজীজাননাহার নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন ১২৮১ সালের পহেলা বৈশাখ তারিখে।[২১] মীর মশাররফ হোসেন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পত্রিকা প্রকাশের সাহস করেছিলেন এবং পত্রিকাটিকে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও দুই বছর প্রকাশ করেছিলেন।

আজীজন নেহার পত্রিকায় কি প্রকাশিত হতো? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা কষ্টকর। যে পত্রিকাকে দেখা যায়নি, তার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা দুরুহ। এ ক্ষেত্রে মীর মশাররফ হোসেনের 'অপ্রকাশিত আত্মজীবনী'র সাহায্য নেয়া যায়। সেখানে মশাররফ হোসেন নিজেই বলছেন–

> প্রথম খণ্ডে "সূচনা" ও "কি লিখি" এই দুই প্রবন্ধ প্রকাশ হইল।
> 'সূচনা'– হুগলির বাঁধা ঘাটে বসিয়া মুসলমান সমাজের দুরাবস্থা ভাবিতে২[ভাবিতে ভাবিতে] একখানি খবরের কাগজ নাই যাহাতে মনের কথা দশজনার নিকট প্রকাশ করা যায়। 'কি লিখি' এই প্রবন্ধ আদি প্রবন্ধ। মুসলমান সমাজে পরিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে 'কি লিখি' প্রবন্ধ আদি প্রবন্ধ। ১২৮১ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে প্রবন্ধ প্রকাশ হইল।[২২]

এই আত্মজীবনী আবিষ্কৃত না হলে মীর মশাররফ হোসেনের 'সাংবাদিক সত্তা'র দিকটি অপ্রকাশিত, অনাবিষ্কৃত থেকে যেত। আমরা জানি ১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এর প্রথম সংখ্যার প্রথম লেখাটা ছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পত্রসূচনা'। ১লা বৈশাখ, ১২৭৯ তারিখে প্রকাশিত 'পত্রসূচনা' পরবর্তীসময়ে 'বিবিধ প্রবন্ধ'(দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থে 'বঙ্গদর্শনের

পত্রসূচনা' শিরোনামে অন্তর্ভূক্ত হয়। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টতই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এভাবে–

> যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দূরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদিগের রচনা পাঠে বিমুখ। ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থিরজ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না । তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষার লেখকমাত্রেই হয় ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশল শূন্য; নয় ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। ... লেখাপড়ার কথা দূরে থাক্, এখন নব্য সম্পদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না।[২৩]

এই অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষার হাল ধরেছিলেন। তিনি বাংলা ভাষাকে উচ্চাসনে আসীন করেছিলেন। বাংলা গদ্যকে স্বাবলম্বী করেছিলেন। *আজীজন নেহার* পত্রিকার প্রথম লেখা 'কি লিখি'তে মীর মশাররফ হোসেন মুসলমান সমাজে পরিশুদ্ধ বাংলা ভাষার চর্চা বিষয়ে লিখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার 'পত্রসূচনায়' দেশীয় কৃতবিদ্যা সম্প্রদায়ের বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা, অনীহার কথা উল্লেখ করে পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন এই আশায় যে, "এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্বুদস্বরূপ ভাসিল; নিয়মবলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্যাস্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবে না। এ সংসারে জলবুদ্বুদ ও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে"।[২৪]

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করে বঙ্কিমচন্দ্র যেন মহাকালের হাতে তা ন্যস্ত করেছেন, অন্যদিকে মীর মশাররফ হোসেন *আজীজন নেহার* প্রকাশ করেছেন নিজ মনের দৃঢ়তায়, পাছে লোকে কিছু বলে– জুজুকে পেছনে ফেলে তিনি সংকল্পে স্থির থেকেছেন।

মীর মশাররফ হোসেন তার সংকল্পে স্থির থাকতে পেরেছিলেন দুই বছর। এর পর নানা কারণে তিনি অটল থাকতে পারেননি। পরিণামে বন্ধ হয়ে যায় পত্রিকাটির প্রকাশনা। মীর মশাররফ হোসেনের জবানীতে সেই সংকল্প ভঙ্গের জবানবন্দী এরূপ–

> আজীজাননাহার পত্রিকায় প্রথম দুই বৎসর বেশ টাকা আদায় হইল। তাহার পর আমার ও মন খারাপ। লিখাও আর পূর্বের মত উৎসাহের সহিত হইল না। মূল্যও পাওয়া যায় না ...প্রেসের দেনা, কাগজের দেনা অনেক দায়ী হইতে হইল। পৃষ্ঠপোষক কাহাকেও পাইলাম না। লিখিবার লোকও আর নাই। মধ্যে মধ্যে আমার ভক্তিভাজন হরিনাথ মজুমদার বিশেষ সাহায্য করিতেন। আমার দুঃসময় সমাগত বলিয়াই যেন তাঁহার মাথা বেদনা শীরপীড়া রোগ উপস্থিত হইল। তিনি লেখাপড়ার কর্ম হইতে একপ্রকার বিরত হইলেন।[২৫]

অর্থাভাবে পত্রিকা বন্ধের খবর মীর মশাররফ হোসেন দিয়েছেন করুণ ভাষায় : " পত্রিকা বন্ধ হইয়াছে। যে প্রেসে ছাপাইতাম তাহাদের অনেক টাকা বাকি পড়ায় তহোদের [তাহাদের] প্রেস– হুগলী বোধোদয় যন্ত্রে ছাপাইতে দিলাম। টাকা অভাবে ছাপান কাগজগুলি সেই প্রেসেই রহিয়া গেল।"[২৬]

আজীজন নেহার পত্রিকার প্রকাশে অনেক পত্রিকা সাধুবাদ জানিয়েছিল। যেমন, চুঁচুড়ার ''সাধারণী'' পত্রিকায় 'নতুন পত্রিকা' শিরোনামে *আজীজন নেহার* পত্রিকা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়–

> আজীজন নেহার; বঙ্গীয় মুসলমানগনের মুখস্বরূপ হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, বড় আহ্লাদের বিষয়। সকল সম্প্রদায়েরই পৃথক পৃথক পত্রিকা থাকা উচিত। বিশেষত বঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বড় অল্প নহে। নিজ বাঙ্গালার হিন্দু ১,৮১,০০৪৩৮ জন, মুসলমান ১,৭৬,০৯,১৩৫ জন; সুতরাং নিজ বাঙ্গালায় হিন্দুমুসলমান প্রায় সমান। অথচ মুসলমানদের হইয়া প্রায় কেহই কোন কথা কহে না, এটি ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে। ...আজীজন নেহার আমাদের একরূপ প্রতিবাসী। এরূপ উদারচেতা প্রতিবাসীর মঙ্গল হউক।[২৭]

আজীজন নেহার পত্রিকা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যও সে সময় প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন– 'সাধারণী'তে বলা হয়েছিল–

> আজিজন নেহার। এই অভিনব পত্রের আমরা যথার্থই শুভানুধ্যায়ী। নহিলে সম্পাদপত্রের দ্বিতীয়বার সমালোচন সাধারণীতে সম্ভব না। আজিজন নেহার ক্রমে একটি পক্ষীর দল হইয়া উঠিতেছে। পত্র এই চারি সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইতিমধ্যে ইহাতে কাকাতুয়া, বুলবুলি, টুনটুনি, দাঁড়কাক, ফিঙে ও তোতা দেখা দিয়াছে; শুদ্ধ চিড়িয়াখানা প্রদর্লন [প্রদর্শন] করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, লক্ষ্ণৌয়ের নবাব কৃত্রিম পাহাড়ে ঘোড়া সাপ দেখান; ইহারা ইতিমধ্যে কেঁচো বাহির করিয়াছেন, বোধ হয় ক্রমে সাপ বাহির করিবেন। বিদ্রুপ ত্যাগ করিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করি, অভিনব পত্র সম্পাদকের এরূপ রুচি কেন? এ রুচি বিকৃতি।[২৮]

অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত সাপ্তাহিক *সাধারণী* পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'জাতিবৈর' প্রবন্ধটি ছাপা হয় ১১ কার্তিক, ১২৮০ সালে। ৪ শ্রাবণ, ১২৮১ সাল পযর্ন্ত কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হয় *সাধারণী*। এই পত্রিকার সমালোচনা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। *আজীজন নেহার* পত্রিকা মাসিক/ পাক্ষিক/ সাপ্তাহিক- কোন পরিচয়ে বের হত, এ প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়নি। *সাধারণী*র বক্তব্য থেকে বিষয়টি স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। *আজীজন নেহার* পত্রিকার প্রশংসাসূচক সমালোচনা 'সাধারণী'তে প্রকাশিত হয় ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১/ ৮ জুন ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে। এটি ছিল 'সাধারণী'র ২য় ভাগ, ৮ম সংখ্যা। *সাধারণী*র ২য় ভাগ ১৩

সংখ্যায় *আজীজন নেহার* পত্রিকা সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা প্রকাশ হয় ২৯ আষাঢ় ১২৮১/১২ জুলাই ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে। মাঝখানের চার সপ্তাহের ব্যবধানে *সাধারণী*র বক্তব্য অনুসারে (পত্র এই চারি সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে) *আজীজন নেহার* পত্রিকার চারটি সংখ্যা প্রাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ *আজীজন নেহার* পত্রিকাটি সাপ্তাহিক হলেই কেবল এই মত সত্য বলে বিবেচিত হয়। তাই এ বিষয়ে দৃঢ়ভাবে অনুমান করা যায় যে, *আজীজন নেহার* পত্রিকাটি সাপ্তাহিক হিসেবেও প্রকাশিত হয়েছিল। *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকায়* ২৮/৩/১৮৭৪ তারিখের বিজ্ঞাপনে *আজীজন নেহার* পত্রিকা 'মাসিক বাংলা পত্রিকা' হিসেবে প্রকাশের কথা বলা হয়।[২৯] বৈশাখ, ১২৮১ (এপ্রিল, ১৮৭৪) সংখ্যার 'এডুকেশন গেজেটে'ও একে মাসিক সংবাদপত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তাই সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, প্রথমে এটি মাসিক হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরে তা সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। মীর মশাররফ হোসেনের *আজীজন নেহার* পত্রিকা প্রকাশের পর যেমন *সাধারণী*তে সমালোচিত হয়েছিল, তেমনিভাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *বঙ্গদর্শন* প্রকাশিত হলে *সোমপ্রকাশ* পত্রিকা *বঙ্গদর্শন*কে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছিল। *সোমপ্রকাশে*র সমালোচনাটির জবাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *বঙ্গদর্শনে*র প্রথম সংখ্যার একটি 'পুনর্মুদ্রণ' সংখ্যা বের করেছিলেন–এতে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ, শব্দের প্রয়োগ প্রভৃতি সংশোধিত হয়। *সাধারণী*র সমালোচনার ফলে মশাররফ হোসেন আজীজন নেহার পত্রিকায় কীরূপ পরিবর্তন এনেছিলেন, তা জানার তীব্র কৌতুহল জাগে। সচিত্র মাসিকপত্র *প্রদীপ* (সম্পাদক–বিহারীলাল চক্রবর্তী)এর পৌষ ১৩০৮ সংখ্যায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মীর মশাররফ হোসেন ও *আজীজন নেহার* সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন তা উল্লেখযোগ্য : "কুষ্টিয়া নিবাসী মীর মশাররফ হোসেন বাল্যকাল হইতেই বঙ্গসাহিত্যে নিতান্ত অনুরক্ত। কাঙ্গাল হরিনাথ ইহার সাহিত্যগুরু: প্রথমে 'গ্রামবার্ত্তা'য় পরে 'প্রভাকরে' লিখিয়া লেখা শিখিয়া, মীর সাহেব 'আজীজননেহার' নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন। মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকা মধ্যে তাহাই সর্ব্বপ্রথম বলিয়া পরিচিত। ...তৎকালে একজন মুসলমানের পক্ষে ভাল বাঙ্গালা রচনা করিবার বহু বাধাবিঘ্ন বর্ত্তমান ছিল। তাহা অতিক্রম করিয়া মীর মশাররফ হোসেন যে সাহিত্য শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।"[৩০]

আমরাও মনে করি মুসলমান সম্পাদক মীর মশাররফ হোসেন যে পরিস্থিতিতে *আজীজন নেহার* প্রকাশ ও প্রচার করে দুইবছর টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন, তা কম অর্জন নয়।

হিতকরী

মীর মশাররফ হোসেন *হিতকরী* নামে আরও একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। *হিতকরী* সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাময়িকপত্র' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থে বলেন–

> হিতকরী (পাক্ষিক) বৈশাখ (?) ১২৯৭। কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়া হতে প্রকাশিত। রাজশাহী 'শিক্ষা–পরিচয় লেখেন: "আমরা জানিয়াছি একজন সুপ্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী সাধারণের নিকট অদৃশ্য থাকিয়া হিতকরীর পরিচালনা করিতেছেন। "আমাদের মনে হয় পত্রিকাখানি মীর মশাররফ হোসেনের, এবং হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ) অন্তরালে থাকিয়া উহার পরিচালনা সহায়তা করিতেন। দ্বিতীয় বর্ষে হিতকরী টাঙ্গাইলে স্থানান্তরিত হয়।[৩১]

আনিসুজ্জামান তাঁর *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র* (১৮৩১-১৯৩০) গ্রন্থে *হিতকরী* সম্পর্কে উল্লেখ করেন : "*হিতকরী*। সম্পাদক: মীর মশাররফ হোসেন। পাক্ষিক, প্রকাশ ১৮৯০ (এপ্রিল?) কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া থেকে প্রকাশিত। *হিতকরী* পত্রিকাটিও ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামী। এর লেখক এবং গ্রাহকের মধ্যে মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল।"[৩২] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম তাঁর *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত* শীর্ষক গ্রন্থে মীর মশাররফ হোসেনের *হিতকরী* সম্পর্কে উলেখ করেন–

> *হিতকরী*: পাক্ষিক পত্র। প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১২৯৭ সাল; ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ। কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়া থেকে প্রকাশিত; দ্বিতীয় বর্ষে টাঙ্গাইলে স্থানান্তরিত। প্রথম পর্যায়ে দু'বৎসরাধিক চালু ছিল; ১৩০৬ সালের বৈশাখে কলকাতা থেকে নব পর্যায়ে প্রকাশিত হবে বলে বিজ্ঞাপিত হয়। প্রথম পর্যায় পত্রিকায় বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা হিসাবে বাংলা শিক্ষা ও চর্চা এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নবপর্যায়ের বিজ্ঞাপনে ঘোষণা ছিল, 'নূতন প্রণালীতে খাঁটি নিখুঁত মুসলমানিভাবে বাহির হইবে। সম্পাদক মীর মশাররফ হোসেন, পরে মোসলেমউদ্দীন খান। নব পর্যায় পত্রিকা মীর মশাররফ হোসেন ও এস.কে.এম মহম্মদ রওশন আলীর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হবে বলে ঘোষিত।[৩৩]

এই অল্প তথ্য মীর মশাররফ হোসেনের পত্রিকা *হিতকরী* সম্পর্কে কৌতূহল মেটাতে অক্ষম। আসলে এই পত্রিকাটিও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এটি নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয়নি। আবুল আহসান চৌধুরী তাঁর 'মীর মশাররফ হোসেন' গ্রন্থে এবং শামসুজ্জামান খান তাঁর *মীর মশাররফ হোসেন : নতুন তথ্যে নতুন ভাষ্যে* গ্রন্থে এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। আমরা *হিতকরী* সম্পর্কে কৌতূহল মেটাতে মীর মশাররফ হোসেনের নিজস্ব বক্তব্য বিশ্লেষণ করব। *হিতকরী*র প্রকাশ সম্পর্কে মীর মশাররফ হোসেন বলেন : "করুণাময়, কৃপাময়, কৃপাসিন্ধু ভববন্ধু ভগবান! তোমারই অনন্তগুণ আশ্রয় ও সহায় করিয়া হিতকরী ১২৯৭ সনের ১৫ই বৈশাখে প্রকাশ হইল। তুমিই রক্ষক, তুমিই প্রতিপালক। জীবন মরণ সকলই তোমার হস্তে। যাহা তোমার

ইচ্ছা।[৩৪] *হিতকরী* কোন পরিচয়ে (দৈনিক/ সাপ্তাহিক/ পাক্ষিক/ মাসিক প্রভৃতি) প্রকাশিত হতো তা জানা যায় এ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই। সম্পাদকের ভাষায় : "হিতকরী একখানি পাক্ষিক সংবাদ পত্রিকা। কুমারখালী মথুরানাথ যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য মায় ডাকমাশুল বার্ষিক ২ টাকা। প্রতিমাসের ১৫ই আর সংক্রান্তির দিনে প্রকাশিত হয়। ... এজেন্টগণ নিকট ও হিতকরী আপীষ ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলেই হিতকরী পাওয়া যায়।"[৩৫] *হিতকরী*র উদ্দেশ্য ছিল সবার হিতকথা প্রচার, যাতে সাধারণের হিতের আশা থাকবে। জাতিগত কি ধর্মগত কোন পক্ষকে লক্ষ্য করে কিছু প্রকাশ করা হবে না। মীর মশাররফ হোসেনের জন্মস্থান কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া থেকে কুমারখালী মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে *হিতকরী* প্রকাশিত হত। *হিতকরী*র মুদ্রাকর ছিলেন রজনীকান্ত ঘোষ এবং প্রকাশক ছিলেন দেবনাথ বিশ্বাস। প্রতিসংখ্যার মূল্য ছিল দুই পাই। সম্পাদক হিসেবে কারো নাম ছাপা হতো না।

মীর মশাররফ হোসেন সচেতন সম্পাদক ছিলেন। তিনি *হিতকরী*র ২য় ভাগ ৮ম সংখ্যায় (২০ আষাঢ় ১২৯৮সাল/ ২ জুলাই ১৮৯১ খ্রি.) লেখেন–

> লেখক, সম্পাদক, অক্ষরযোজক, সংশোধক একস্থানে নহে, ভিন্ন২[ভিন্ন ভিন্ন] স্থানে বাস। ... লেখকগণ মধ্যে কেহ প্রেসিডেন্সী ডিভিসনে, কেহ রাজশাহী বিভাগে, কেহ বা বহুদূর সাগরপাড় লন্ডন নগরের কেম্ব্রীজ গার্ডনে– সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী যমুনার পাড়ে। স্ব স্ব লেখা দ্বিতীয়বার দেখার কাহারও সুবিধা নাই। হিতকরীর অবস্থাও ঈশ্বর এরূপ করেন নাই যে, একজন শিক্ষিত লোকের সাহায্য নিয়মিত রূপে পাইতে পারে।[৩৬]

মীর মশাররফ হোসেনের এই কৈফিয়ৎ একজন পাঠকের অভিযোগের প্রেক্ষিতে। মীর মশাররফ হোসেন পাঠকের চাহিদা, মতামতকে যে কতটা গুরুত্ব দিতেন, তা বোঝা যায়।

প্রথম বর্ষে *হিতকরী* পাক্ষিক হিসেবে বের হলেও দ্বিতীয় বর্ষে 'দাশাহিক' বা 'দাশহিক' হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে।[৩৭] পত্রিকা প্রকাশ ও প্রকাশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা তখন বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। *হিতকরী*র বক্তব্যে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় : "...কুষ্টিয়া সবডিভিসন সৃষ্ট হইতে এ পর্য্যন্ত এই হিতকরী লইয়া তিনখানি পত্রিকা প্রকাশ হলো। প্রথম গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, তাহার পর আজীজননাহার। আজীজননাহার দুই বৎসরকাল চলিয়াছিল, গ্রামবার্ত্তা নানা আকারে নানা পরিবর্তনে, নানা বিপদ মাথায় করিয়া, নানা ঝঞ্ঝাট সহ্য করিয়া প্রায় ২৩ বৎসর জীবিত ছিল। ... সুতরাং হিতকরী যে দেশের লোকের নিকট আদর পাইবে, সে আশা দুরাশা।"[৩৮]

হিতকরী প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মীর মশাররফ হোসেন পত্রিকার পাতায় লিখেছেন : "ন্যায্য বলিব, সত্য প্রকাশ করিব।... আমরা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহি,

আমরা সকলের। একচোখা দৃষ্টি আমাদের নাই। যেখানে অন্যায়, সেইখানেই আমরা, যেখানে অত্যাচার, যেখানে অবিচার সেইখানেই আমাদের কথা! আমরা প্রশংসার প্রত্যাশী নহি। আর্থিক সাহায্যের আশাও রাখিনা। সুতরাং আমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই।"[৩৯] কখনো কখনো সত্যপ্রকাশের জন্য *হিতকরী*কে অনেক কটুক্তি, সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। *হিতকরী*তে কুষ্টিয়ার ছোট আদালতের বিচারক বরদাপ্রসন্ন সোমের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের খবর প্রকাশিত হওয়ার কারণে অনেক বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। *হিতকরী*র সহকারী সম্পাদক উকিল রাইচরণ দাসকে ভর্ৎসনা ও অপমান করেন বরদাপ্রসন্ন সোম; শুধু তাই নয় প্রকাশ্য আদালতে *হিতকরী*কে 'পোদ পোঁছা কাগজ' বলে গালি দেয়। শেষ পর্যন্ত বিচারক বরদাপ্রসন্ন সোম *হিতকরী*র সহকারী সম্পাদকের বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করেন।

মীর মশাররফ হোসেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত *হিতকরী* নিয়মিতভাবে ৩০ আশ্বিন ১২৯৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর একমাস পত্রিকা বন্ধ থাকে। সম্পাদক মীর মশাররফ হোসেন একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পাঠককে এ বিষয়ে অবহিত করেন এভাবে–

> হিতকরী জন্মগ্রহণ করিয়া এ পর্যন্ত অবকাশ গ্রহণ করে নাই। বিশেষ কোন কারণে বাধ্য হইয়া ১০ই কার্ত্তিক হইতে ৩০ শে কার্ত্তিক পর্যন্ত হিতকরী বন্ধ থাকিবে। ঈশ্বর মঙ্গল করিলে আগামী অগ্রহায়ণ মাসের ১০ ... হইতে পুনরায় প্রকাশ হইবে। অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণ নিকট হইতে হিতকরী একমাসের বিদায় গ্রহণ করিল।[৪০]

তৃতীয় বর্ষে *হিতকরী* লাহিনীপাড়া থেকে টাঙ্গাইলে স্থানান্তরিত হয়। টাঙ্গাইলে *হিতকরী* মুদ্রিত হতো আহমদী প্রেসে। টাঙ্গাইলে অবস্থানকালে মীর মশাররফ হোসেন এই ছাপাখানার মালিক হন। *হিতকরী* পত্রিকা টাঙ্গাইলে কতদিন চলেছিল তার সঠিক খবর পাওয়া যায় না। পরবর্তীসময়ে মোসলেমউদ্দীন খাঁর সম্পাদনায় *হিতকরী* নবরূপে *টাঙ্গাইল হিতকরী* নামে প্রকাশিত হয়।[৪১] আবদুল কাদির *কোহিনুর* আলোচনা প্রসঙ্গে *হিতকরী* সম্পর্কে একটি বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখ করেন। বিজ্ঞাপনে বলা হয়–

> হিতকরী/ ৪র্থ বর্ষ/ সম্পাদক- মীর মশাররফ হোসেন ও এস. কে. এম মহম্মদ রওশন আলী। ...হিতকরী ১৩০৬ সালের শুভ বৈশাখ হইতে নূতন প্রণালীতে খাঁটি নিখুঁত মুসলমানীভাবে বাহির হইবে।/অগ্রিম মূল্য...দেড় টাকা... কার্যালয়: ১৮ নং হলওয়েলস লেন, কলিকাতা। মফস্বল অফিস: পাংশা, ফরিদপুর।[৪২]

কোহিনুর পত্রিকার বিজ্ঞাপন থেকে ধারণা করা যায় ৪র্থ বর্ষে নব কলেবরে প্রকাশিত হওয়া *হিতকরী* টাঙ্গাইলে মোটামুটি প্রায় একবছর ধরে প্রকাশিত হয়েছিল।

*হিতকরী*র পঞ্চম বর্ষের খবর দিয়েছেন আবুল আহসান চৌধুরী। তিনি লিখেছেন : "...বাংলা ১৩০৭ সালে (১৯০০ খ্রি.) ৫ম বর্ষের হিতকরীও মথুরানাথ মুদ্রাযন্ত্রেই মুদ্রিত হয়। ...এ পর্যায়ে প্রকাশনার পঞ্চমবর্ষে হিতকরী ১৩০৭ সালের শেষভাগ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। ... ১৩০৭ সালের পর হিতকরী আর প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়নি। হিতকরী মোটামুটি পাঁচ বছর চলেছিল, তবে তা বিরতীহীনভাবে নয়। ১২৯৭, ১২৯৮, ১২৯৯, ১৩০৬ ও ১৩০৭ – এই পাঁচ বছর হিতকরী প্রকাশিত হয়। তবে ১৩০০ থেকে ১৩০৫– এই ছয় বছর হিতকরীর প্রকাশ পুরোপুরি বন্ধ ছিল কিনা সে তথ্য অজ্ঞাত।"[৪৩] 'চর্যাপদ' আবিষ্কৃত না হলে যেমন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 'হাজার বছর পুরনো' বলা যেত না, তেমনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের একটি পুঁথির শেষ আশ্রয় হয়েছিল বাকুরা জেলার কাকিল্লা গ্রামের গোয়ালঘরে। তেমনি মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য-কীর্তির অনেকখানিই এখনও অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে। যথাযথভাবে তাঁর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত না হওয়ায়, আবহাওয়াগত কারণে, কীটের পেটে স্থান হয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনের। হিতকরীর ১৩০০-১৩০৫ ছয় বছরের কোন নিদর্শন না পাওয়ায় এখনো তা রহস্যাবৃতই থেকে গেছে।

মীর মশাররফ হোসেন তার উপন্যাস, নাটক, প্রহসনে বিভিন্ন প্রসঙ্গে ও আবহে স্বদেশ, স্বাধীনতা, স্বরাজ বিষয়ে অনেক বক্তব্য রেখেছেন। বাঙালি মুসলমাদের মাতৃভূমি চেতনার সংকট ও সংশয়, সমাজের নানাবিধ সমস্যা, রাজনৈতিক শত্রু-মিত্র নির্ণয়ে সংশয়ের সেই যুগে মীর মশাররফ হোসেন পত্রিকার পাতায় অনেক সাহসিকতার সঙ্গে লিখেছেন। মীর মশাররফ হোসেনের 'অপ্রকাশিত আত্মজীবনী' থেকে জানা যায় যে, সেকালের অনেক খ্যাতনামা মুসলমান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৈয়দ আমির আলী, নওয়াব আব্দুল লতিফ, নওয়াব নবাব আলী চৌধুরী, নওয়াব মীর মোহাম্মদ আলী প্রমুখ। এঁদের সঙ্গ মশাররফকে উৎসাহিত করে থাকবে। তেমনি নিরুৎসাহিত করার তথ্য আছে 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থে : "...সেই হইতে আমি কোন সভাসমিতিতে যাই নাই। ... যাহাদের ঘরে তণ্ডুল নাই তাহাদের আবার সভাসমিতি কি? ... যাহার তণ্ডুলের ভাবনা নাই তিনিই ঐ সকল দেশহিতকর সভায় যাইতে পারেন। দুবেলা উপাসের হাঁড়ী মাথায় বহিয়া পেট পোড়াইয়া দেশের উন্নতি, দেশের হিতসাধন সভায় যাইয়া কৃত্রিমভাবে যোগ দেওয়া ঠিক নহে। আমি সভাসমিতিতে যোগ দিবার উপযুক্তই নই।"[৪৪] মীর মশাররফ হোসেন নিজেকে 'সভাসমিতিতে যোগ দিবার উপযুক্ত' মনে করেননি। কিন্তু পত্রিকার পাতায় তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য আমাদের চমৎকৃত করে। পত্রিকার পাতায় সমাজ-সাহিত্য-ধর্ম-রাজনীতি-সচেতন মীর মশাররফ হোসেনের পরিচয় স্পষ্ট। বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে তিনি লিখছেন :

> কুমারখালী থানার মহিষবাথান গ্রামে একটি বিধবা স্ত্রীলোক তাহার ৮ বর্ষ বয়স্কা মেয়েটিকে ৮০ বৎসর বয়সের একটি প্রাচীনের সহিত বিবাহ দিয়া গৌরীদানের ফল হইয়াছে। বৃদ্ধটি পয়সার লোক, মেয়ের পণ ৩০০ ও

> সমাজের দলপতি ও ঘটককে ১৫০ টাকা দিয়া বিবাহ করিয়াছে। বিবাহের রাত্রি দাঁতের বেদনায় বুড়ো বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারা জাতিতে তিলি। বিবাহ হিন্দু সমাজ অনুসারে হইয়াছে। আজকাল মা-বাপের অত্যাচারেই বালিকাগুলি মারা যাইতে চলিল। এই পিশাচিনীতে ঐ বালিকার হিতৈষিনী অভিভাবিকা বলিতে কেহ রাজী আছেন কি? বৃদ্ধ জামাতা কিছু অনন্ত আয়ু লইয়া পৃথিবীতে আসেন নাই। শীঘ্রই মেয়েটিকে বৈধব্য ব্রহ্মচর্য্যা ব্রতাবলম্বন করিয়া সমাজের মুখোজ্জ্বল করিতে হইবে।[৪৫]

সমাজের বেকারত্ব নিয়ে সচেতন সম্পাদকের বক্তব্য :

> আমাদের মত অপদার্থ জাতি আর জগতে নাই। বিদ্যাবুদ্ধির যে একটু মান সম্ভ্রম ছিল, তাহাও এবার বিলের আন্দোলনেই গিয়াছে। এক মুষ্ঠি অন্নের জন্য আমরা দেশে বসিয়া কত অপমান কত লাঞ্ছনা সহ্য করিতেছি, তবুও লজ্জা নাই। এইত দলে২ [দলে দলে] কত বলিষ্ঠকায় শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত যুবক সমান্য চাকুরীর জন্য ঘুড়িয়া বেড়াইতেছেন, ইহাদের কি স্বাধীন ব্যবসার দ্বারা জীবিকা অর্জনের কোন উপায় নেই? উপায় অনেক আছে, নাই কেবল চেষ্টা ও উদ্যোগ। চেষ্টা ও উদ্যোগবিহীন হইয়াই বাঙালী জাতি দিন২ [দিন দিন] অধ:পাতে যাইতেছে, দাসত্ব মিষ্ট লাগিতেছে। অনেক তোষামোদের পর আমরা একটি সামান্য চাকুরী যোগাড় করিতে পারিলে যেন হাতে স্বর্গ পাই। দাসত্বে যে সুখ নাই, দাসত্বে যে কেবল দুঃখ তাহা জানিয়াও আমরা দারিদ্রের উৎপীড়নে অস্থির হইয়া এমন হীন অবস্থাকেও জীবনের শান্তির আকর মনে করিয়া প্রফুল্লচিত্তে আলিঙ্গন করিতেছি। আমরা দিন২ [দিন দিন] আমাদের আত্মসম্মান জ্ঞান হারাইতেছি। এখন ১৫/২০ টাকায় চাকুরীর জন্য একজন ভদ্র যুবককে যেরূপ নীচ কাজ করিতে দেখা যায়, পূর্বে এরূপ ছিল না। ...শত২ [শত শত] বলিকাষ্ঠায় যুবকবৃন্দকে নগরে২[নগরে নগরে] ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া কাহার না কষ্ট হয়? প্রত্যেক হৃদয়বান স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য স্বদেশবাসীর দরিদ্র মোচন করা, নতুবা কিছুতেই কিছু হইবে না।(হিতকরী ২য় ভাগ, ২য় সংখ্যা, ২০ বৈশাখ ১২৯৮ সংখ্যা)[৪৬]

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের কৃষক সম্বন্ধে মীর মশাররফ হোসেনের প্রাজ্ঞ বয়ান :

> দেশের অবস্থা দেখিলে চোখে জল আইসে। কত ভদ্র পরিবার, কত কৃষক পরিবারে অনাহারে ও অল্পাহারে শীর্ণকায়। ধান্য অতি দুর্মূল্য; ধান্য কিনিয়া২ [কিনিয়া কিনিয়া] গৃহস্থ হয়রান হইয়াছে, আর সংসার চালাইতে পারিতেছে না। আমাদের সোনার সংসার সকল দুঃখের আগার হইতেছে। ... এখন কি উপায়ে আমাদের স্বদেশবাসী সুখী হয়, ইহা

> প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই চিন্তার বিষয়। আমাদের দারিদ্রের কারণ অনুসন্ধান করিলে প্রথমত: দেখা যায়– কৃষি কার্যের প্রতি সাধারণের অনাস্থা। সাধারণ গৃহস্থের ছেলে যাই একটু লেখাপড়া শিখিতেছে, অমনি চাকুরী২ [চাকুরী চাকুরী] করিয়া ঘুরিতেছে। কৃষি কার্যের উপর সামান্য লোকেরই মনোযোগ দেখা যায়। অশিক্ষিত কৃষক পুরাতন প্রণালী অনুসারে যাহা কিছু উৎপন্ন করিতেছে, তাহাতে দেশের অভাব দূর হইতেছে না। আমাদের দেশে যে জমি আছে, তাহাই যদি নতুন যন্ত্রাদি দ্বারা উৎকৃষ্ট প্রণালীতে চাষ করা যায়, তাহা হইতেই প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতে পারে ও দেশের কষ্ট দূর হইতে পারে। শিক্ষিত যুবকেরা এদিকে একটু মনোযোগ করিলেই দেশের এই প্রধান অভাবটি সহজেই দূর হইতে পারে। সকল বিষয়ে গভর্নমেন্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে সে জাতির কখনোই উন্নতি হইবে না।"[৪৭]

যেকোনো দেশের সমৃদ্ধির জন্য তরুণ সমাজের আলোকিত হওয়া জরুরি। এই তরুণরাই যদি নেশায় ডুবে থাকে তাহলে সমাজের অবস্থা নাজুক হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে সমাধানের জন্য ব্যক্তিপর্যায় থেকে সরকারি বিভিন্ন পদক্ষেপ জরুরি। মশাররফ হোসেনের লেখায় সেই বিষয়গুলি ফুটে উঠেছে :

> অহিফেন যে বিষ তাহা কয়জনে ভাবিতেছি ? মহাদেবের দোহাই দিয়া তামাক হইতে আরম্ভ করিয়া গাঁজা, ভাং, আফিং, গুলি, চরস, চণ্ডু, মদ বিবিধ মাদকদ্রব্য সেবন করিয়া অষ্টপ্রহর উন্মত্ত হইয়া কত জীবন জন্মের মত নষ্ট হইয়া যাইতেছে কে তাহার তত্ত্ব লয়? যাঁহারা ইহার অপকারিতা বুঝিয়াছেন, যাঁহারা ইহার সেবায় বিরত, ধন্য তাঁহাদের সহানুভূতি ও প্রেম!! তাঁহারাও দুর্ভাগ্য নেশাসক্ত ব্যক্তিদিগের জন্য চিন্তা করেন না। প্রথম শ্রেণীর মাদকগুলি যাহাতে দেশ উচ্ছন্ন করিতেছে, গভর্নমেন্ট তাহার জন্য একটুও ভাবিতেছেন না। গভর্নমেন্ট কি জানেন না যে দেশে ধর্ম্মের নামে মানুষ খুন হয়, পুত্র বিসর্জ্জন, বালিকা সহবাস প্রভৃতি অনেকে গৌরবের কথা মনে করেন। অধিক মাদকদ্রব্যগুলি মহাদেবের প্রসাদ বলিয়া যে দেশের অধিকাংশ লোকের বদ্ধমুল বিশ্বাস হইতে পারে? আফিংখোর ও গুলিখোরদের সংসারের কোনই কাজে আইসে না। তবে যাঁহারা ঔষধার্থে অল্প মাত্রায় আফিং খান তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। এদেশে সহস্র সহস্র নরাধম আফিং ও গুলি খাইয়া যে কেবল নিজেরা নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহাই নহে; তাহাদের ধনসম্পত্তি পরিবারবর্গ সকলই বিসর্জন দিতেছে। ... এদেশ আফিং সেবনে যে সর্বনাশ হইতেছে কে না তাহা জানে? কিন্তু কয়জন লোকে তাহার প্রতিধ্বনি করিতে যত্নবান? আহিফেন সেবনে আত্মহত্যা প্রতিদিনই হইতেছে। কত পরিবার, কত গ্রাম এই আফিং এর অত্যাচারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ... বঙ্গের দুরবস্থাপন্ন অহিফেনসেবী ভাতৃগণ! তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভুত হইয়া

> আছে, নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিবে না।... অহিফেন পরিত্যাগ কর। ভাই বঙ্গের গন্যমান্য ব্যক্তিগণ। ... অহিফেনের অত্যাচার যাহাতে রহিত হইয়া এ দেশ রক্ষা পায়, তাহার উপায় বিধানার্থে পার্লিয়ামেন্টে আবেদন করুন; নতুবা এদেশের রক্ষা নাই।[৪৮]

উৎকোচ বা ঘুষ দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে অন্যতম প্রধান বাঁধা। মীর মশাররফ হোসেন একে রোগের সঙ্গে তুলনা করে লিখেছেন:

> এ রোগটি বাঙালীর মধ্যেই প্রায় দেখা যায়। নিম্নশ্রেণীর ক্ষুদ্রমতি সাহেবদিগের মধ্যেও ইহার কম প্রচলন নহে। উৎকোচ কাহাকে বলে তাহা আর কাহাকে বুঝাইয়া দেওয়ার আবশ্যকতা নাই। বঙ্গের ঘরে ঘেরে আবালবৃদ্ধ ধনীদ্ররিদ্র সকলই ইহার ভূক্তভোগী; দণ্ডবিধি আইনে এই উৎকোচগ্রহীতা রোগের সুন্দর ঔষধের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু রোগ নির্ণয় অভাবে অতি অল্প রোগীর ভাগ্যেই সে ঔষধ প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। উৎকোচ গ্রহণ প্রথা বহুকাল প্রচলিত ব্যাধি; ইহা এখন মানুষের স্বভাবের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এ ব্যাধির উপশম হওয়া সহজ কথা নহে। বহুদিনের পীড়া একদিনে কখনই ভাল হইতে পারে না। এই উৎকোচগ্রহীতা রোগ শনৈঃ শনৈঃ বেগে মানুষের হৃদয় ক্রমে অধিকার করিয়াছে। ...সর্ব্ব শ্রেণীর সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেই ইহার আধিপত্য। এতদ্বারা দেশের ও জনসমাজের মহা অনিষ্ট সাধন হইতেছে অথচ ইহার দিকে দেশের গন্যমান্য ধুরন্ধর ব্যক্তিসকল, দেশীয় সংবাদ পত্রের লেখকসকল, সমাজ সংস্কারক ভ্রাতৃগণ সকলেই উদাসীন ...। এই মহাঅনিষ্টকর প্রথার অপকারিতা প্রকৃতপক্ষে লোকের হৃদয়ঙ্গম; মৃত বাঙ্গালীর কখন হইবারও আশা নাই। উৎকোচ না করিতেছে কি? ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া দেশে অন্যায় অবিচার স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, প্রবল অত্যাচারীকে প্রশ্রয় দিয়া নিরপরাধী দরিদ্রের রক্তশোষণ করিতেছে। আজকাল বঙ্গদেশে জাতীয় মহাসমিতির কথা শুনিতে পাই, অনেক বড় বড় বিষয় এই সমিতির আলোচ্য। কিন্তু কৈ, কয়জন লোকে দেশের এই মহাপাতকের বিষয় চিন্তা করিতেছে? ... উপরি অঙ্ক লাভ করিতে পারিলে আর মানুষ আজকাল সমাজে মান্যগন্য হন না। যিনি উপরি অঙ্ক লইয়া সমাজে ধূমধাম করিতে পারিলেন, তিনিই মানুষ; সমাজ তাহারই পদাবনত। এই জাজ্বল্যমান কুদৃষ্টান্ত আরও কুফল প্রসব করিতেছে; সাধুর সদুপদেশ, দণ্ডবিধির শাসন ইহার সমক্ষে কিছুই ফলপ্রদ হইতেছে না।"[৪৯]

দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনির কাজ সমাজের অত্যাচার অনাচার প্রতিহত করা। যদি এই বাহিনি অন্যথা করে তবে কেমন অবস্থা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। মশাররফ হোসেনর লেখায় পুলিশের অত্যাচারের বিবরণ : "কলকাতার

ফেনিক বাজার থানার নিকট দিয়া একজন খৃষ্টিয়ান মহিরা কার্য্যস্থানে যাতায়াত করিতেন; ঐ থানার বাবুরা মহিলাটির প্রতি ঠাট্টাবিদ্রূপ করায় তিনি স্বামীকে গিয়া সবিশেষ বলিয়া দেন। স্বামী ঘটনার আদ্যোপান্ত জানিবার জন্য নিকটস্থ দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন এমন সময় থানার মুনসি ও জমাদার তাহাকে ধরিয়া গুরুতর প্রহার করেন। পুলিশের বিরুদ্ধে নালিশ হইয়াছে। মোকর্দ্দমা এখন বিচারাধীন।"[৫০]

কুষ্ঠ রোগীদের দুরবস্থা সম্বন্ধে মশাররফ হোসেনের বক্তব্য : "পৃথিবীতে সকলেরই আশ্রম আছে। পক্ষীরও বাসা আছে। কিন্তু হতভাগ্য কুষ্ঠ রোগীদের দুরবস্থা দেখিলে, যে মানুষ, তাহার হৃদয় না গলিয়া থাকিতে পারে না। সুস্থকায় ব্যক্তিদিগের জন্য আশ্রম যথেষ্ট আছে; কিন্তু নিরাশ্রম এই কঠিন রোগীর হৃদয়ে কি একটু আরাম চায় না? তাহাদের সংশ্রবে থাকিলে আমরাও ঐ সংক্রামক রোগাক্রান্ত হইব বলিয়া আমরা তফাৎ সরিয়া পড়িয়া শিখিয়াছি, কিন্তু পরমেশ্বর প্রদত্ত দয়ামায়া থাকিতেও ঐ সকল নিরাশ্রম ব্যক্তিদিগের জন্য একটু ভাবিতে শিখিয়াছি কি? সকলেই আমরা মানুষের অবয়ব পাইয়াছি, কিন্তু সকলেই মানুষ নই। বৈদ্যনাথের কুষ্ঠ রোগীদিগের দুর্দ্দশার কাহিনী পাঠকবর্গ জানেন কি? শুনিলে হৃদয় ফাটিয়া যায়। তাহাদের দুঃখ বিমোচন কবিবার জন্য বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু গিরিজানন্দ দত্তঝা ও বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু এই তিনজন সহৃদয় মহাত্মা যে সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ঈশ্বর ইহার সহায় হউন।[৫১]

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়েও আছে তাঁর চিন্তাশীল মন্তব্য : "দশ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু-মুসলমানের এই বঙ্গে যে রূপ পিরীত প্রণয় ছিল, এইক্ষণ তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে। শত্রুতার ভাব যেন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। যতই শিক্ষার পথ পরিষ্কার হইতেছে, বিদ্বেষভাব, বিকারভাব, হিংসার ভাব এতই বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙ্গালা নাটক, উপন্যাস, পাঠ্যপুস্তক, সংবাদ পত্রিকা প্রভৃতিতে ঐ রূপ বিদ্বেষভাব থাকাও শত্রুতার এক প্রধান কারণ। যতদিন হিন্দু ভ্রাতৃগণ ঐ বিষয়টা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিবেন, তত দিন হিন্দু-মুসলমানে পরস্পরের অন্তরের সহিত কখনই সোনায় সোহাগার ন্যায় মিল হইবে না। কতকগুলি হিন্দু অভিমানী গ্রন্থকার এবং পত্রিকার সম্পাদক হঁইরাই হইতেছেন এই মনোমালিন্যের মুল এবং আমাদের মতে ভারতের কন্টক। যদি যুক্তিতে এ কথা প্রমাণিত করে যে, ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মনে মুখে মিলন ভারতের পক্ষে অকল্যাণ, তবে যেটুকু মিশামিশি ভাব প্রকাশ্যে দেখা যায়, সেটুকুও না থাকা ভাল। আর যদি মিলনই শ্রেয়ঃ হয়, তবে পূর্ব্বে যাহা হইয়াছে,তাহা সংশোধনের চেষ্টা আবশ্যক, ভবিষ্যতে সর্তক হওয়াও যুক্তিসঙ্গত। ক্রমে এমন দিন আসিবে যে, মুসলমানগণ ঐ সকল লেখার প্রতি লাইনে২ [লাইনে লাইনে] প্রতিবাদ করিবে। সে সময়ের শত্রুতা ও দৃঢ়, বন্ধুতা ও সৃদৃঢ়। যিনি যাহাই ভাবুন, আমরা বলি যে, হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সীমা অতিক্রম করিয়া বাহিরে না যান। ভারতে উভয় জাতির ক্ষমতাই সমান।"[৫২]

শিক্ষা প্রসঙ্গে মশাররফ হোসেনের কয়েকটি বক্তব্য :

মাননীয় সহযোগী সুধাকর বলিতেছেন বাঙ্গালার স্কুলপাঠশালা সমূহে যে সকল পাঠ্যপুস্তক ছাত্রদিগের পাঠের জন্য নির্দিষ্ট আছে, তাহাতে অনেক স্থানে এমন ভাব আছে যে, মুসলমানের মনে বড়ই আঘাত লাগে। মুসলমান ছাত্রগণ বাধ্য হইয়া তাহাই কণ্ঠস্থ করে। মাননীয় সহযোগী এক 'যবন' শব্দ লইয়া দুঃখ করিয়াছেন, আমরা বলিতেছি, হিন্দু লেখকগণ, কবিগণ তাহাদের লিখিত পুস্তকে মুসলমানকে নিতান্তই নীচভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। পাগল সাজাইতে মুসলমান, আহাম্মকের প্রমাণ করিতে হইলে মুসলমান, অত্যাচারীর চিত্র আঁকিতে মুসলমান, বিশ্বাসঘাতকের ছবি দেখাতেই হইলে মুসলমান, গালাগালি দিতে হইলেও ঐ মুসলমান। ইহারও দৃষ্টান্ত বিস্তর আছে। খুঁজিতে গেলে মুসলমানের নিন্দাবিহীন হিন্দুর লিখিত পুস্তক পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। মুসলমানের লিখিত বাঙ্গালা পুস্তক এরূপ দেখা যায় না যে, বিদ্যালয়ে পাঠ্যাশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। আমরা মুসলমান লেখক মহোদয়গনকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা এই একটা প্রধান অভাবমোচন-প্রতি দৃষ্টি করুন। পুস্তক থাকিলে অবশ্যই দু'কথা বলা যাইতে পারে। আসলেই নাই কাযেই যাঁহাদের একচাটিয়া ব্যবসা, তাঁহারা যাহা লিখিয়া দিবেন, তাহাই পাঠ করিতে হইবে। যদি কোন মুসলমান এই প্রদান অভাবমোচন করিতে বদ্ধপরিকর হন, তবে আমাদের অনুরোধ হিন্দুগণ যে ভাবে যে তুলিতে মুসলমানচিত্র আঁকিয়া সাধারণের গোচর করিয়াছেন, কোন মুসলমান হস্ত হইতে যেন হিন্দুর ছবি যে প্রকারে আঙ্কিত না হয়। স্থুল কথা অভাবমোচন।[৫৩]

বঙ্গীয় মুসলমান-ভ্রাত:গণ! আর অনুগ্রহের ভরসায় নিজ জীবন মাটী করিবেন না। রাজার অনুগ্রহ আছে, ইচ্ছা আছে, দয়ার ত্রুটি নাই। কিন্তু শিক্ষিত লোক না পাইলে রাজা কি করিবেন! এখন এ কথাও মীমাংসা হইল, উপযুক্ত লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আর কি? আর নিশ্চিতভাবে থাকা কেন ? প্রাণপণে শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করা কর্তব্য। অনুগ্রহ কথাটা খুব ভাল, কিন্তু জাতীয় উন্নতির পথের মহাকন্টক। রাজা স্পষ্ট বলিয়াছেন, উপযুক্ত পদ লাভ হইবে। এখন কিসে উপযুক্ত হওয়া যায়, সেই বিষয় চিন্তা করাই মুসলমান ভ্রাতাগণের কর্ত্তব্য।"[৫৪]

বিগত ২১ অগ্রহায়ণ তারিখের বঙ্গবাসীতে প্রকাশ হইয়াছে যে, 'কলিকাতার সন্নিকটের হুগলি। কলিকাতায় ভাল ভাল কলেজ আছে। কাজেই হুগলি কলেজ রাখা না যায়. গবর্ণমেন্টের দ্বিমত দাড়াইয়াছে। না রাখাই সম্ভব। একি কথা? মহাত্মা হাজী মহসেন দত্ত সম্পত্তির আয় হইতেই হুগলি কলেজ অথবা হুগলি মাদ্রাসা। কেবল মুসলমানের শিক্ষা নিমিত্তই মহাত্মা হাজী মহসেন রাজার হস্তে বিস্তর সম্পত্তি দিয়া

গিয়াছেন। সেই টাকার দ্বারা কয়েকটি জিলা যথা ঢাকা রাজশাহীতে মাদ্রাসা খুলিয়াছে। অনেক স্কুলে মহসেন ফন্ডে শিক্ষার্থীর সাহায্য হইতেছে। হাজি মহসিনের বসতি স্থান ভারতবর্ষে নহে। তিনি ভিন্নদেশবাসী হইয়াও ভারতীয় মুসলমান কল্যাণে এই মহতি কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ঐ কলেজের আর একটি নাম মহসিন কলেজ। হাজী মহসিনের ২য় কীর্তি হুগলির এমামবাড়ী। তিনি যে উদ্দেশ্যে সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছিলেন, কালে তাহার অনেক লোপ হইতেছে। এখন দেখিতেছি, কলেজটিও চলিল। বঙ্গীয় মুসলমানগণ কি এ সংবাদে যথার্থই নীরব থাকিবে ?"[৫৫]

যেরূপ মাদ্রাসা হুগলি, ঢাকা, রাজশাহী, পাটনা প্রভৃতি স্থানে বর্তমান, ঐরূপ মাদ্রাসার সংখ্যা যতদূর বৃদ্ধি সম্ভব তাহা করা কর্তব্য। আমাদের মতে প্রতি মহকুমায়, এমনকি প্রতি বহুসংখ্যক মুসলমান অধিবাসী ভদ্রপল্লীতে শাখা মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রনিবাস থাকা প্রয়োজন।...সমিতির অবস্থা ভাল হইলে, অর্থভাণ্ডারে অর্থের স্বচ্ছলতা জন্মিলে, ছাত্রনিবাসের ছাত্রগণের আহারের ব্যয় একেবারে উঠাইয়া দেওযা কর্তব্য। মাদ্রাসার বেতন সম্বন্ধে ঐরূপ বিবেচনা সঙ্গত।"[৫৬]

মশাররফ হোসেনের ভাষা-ভাবনা :

কিছুদিন হইতে এফএ ও বিএ কোর্সের মধ্যে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হয় সেজন্য চেষ্টা হইতেছিল। কিন্তু প্রস্তাবকারিগণ এ বিষয়ে বিফল মনোরথ হইয়াছেন। সিন্ডিকেটের মিটিং এ অধিকাংশের মতে বাঙ্গালা পুস্তক নির্ধারণ অনাবশ্যক বলিয়া স্থির হইয়াছে। বাঙ্গালা পুস্তক যে এলএ ও বিএর মধ্যে স্থান পাইবে, তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যে, তবে সংস্কৃত রাখিবার প্রয়োজন কি ? এ মৃত ভাষা লইয়া বৃথা সময় নষ্টের প্রয়োজন কি? বরং বাঙ্গালা আমাদের দেশের লোকের অনেক কার্য্যে আসে; কিন্তু সংস্কৃত এমনকি বিশেষ কোন কার্য্যে আসে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ছাত্রেরা পরীক্ষা দিয়া কলেজ হইতে বাহির হইয়া কোন বিষয়ে সংস্কৃতের চর্চা প্রদর্শন করেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক যে সকল বিভাগে প্রবেশ করেন, তাহাতে সংস্কৃতের কোন আবশ্যক নাই। বরং বাঙ্গালার আবশ্যক আছে। বাঙ্গালীর ছেলে, "বেলা কত বেজেছে" অন্তত এইরূপ হাস্যজনক কথাগুলো না বলে, এই দেখিতে চাই। যদি বাঙ্গালার প্রতি এক উপক্ষো দেখান হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত থাকিবার কোন আবশ্যক দেখি না। যদি কেহ সংস্কৃত পড়িতে বাসনা করেন তিনি বাড়িতে পড়িবেন। সংস্কৃতের চর্চাও হয়, আর বাঙ্গালারও উন্নতি হয়,এই আমাদের ইচ্ছা। ইংরাজীর বিশেষ উন্নতি হয় এবং তৎসংগে এ

> সকলেরও কিছু উন্নতি হয়, এই আমাদের প্রার্থনা। অনেক বাঙ্গালীর ছেলে একটু বাঙ্গালা বলিতে ও লিখতে গলদঘর্ম কলেবর হইয়া পড়েন, বড় দুঃখের বিষয়।"[৫৭]
>
> বর্তমান অবস্থায় ইংরাজী শিক্ষা না করিলে রাজদ্বারে কোনরূপ প্রত্যাশা নাই; জীবনোপায়ই কঠিন, ভার মহাভার বলিয়া বোধ হইবে, কাজেই ইংরাজী শিখিতে হইবে।"[৫৮]
>
> উর্দ্দু ফারসী শিক্ষা অবহেলা করিয়া শুধু ইংরজী কি কেবলই বাঙ্গালা শিক্ষা করিলে, সমাজে মুখ পাইবার উপায় নাই।"[৫৯]

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সমালোচনাও স্থান পেয়েছে *হিতকরী*তে। যেমন :

> *জমিদার ও পঞ্চা*ইত ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মাসিক পত্রিকার প্রকৃত উদ্দেশ্য অতি মহৎ, যদি কার্য্যে পরিণত হয়, তবে দেশের প্রকৃত অভাব দূর হইবে, এদশের প্রকৃত মঙ্গল এইরূপ সদুদ্দেশ্য সাধনের উপর নির্ভর করিতেছে।"[৬০](হিতকরী, ২০ আষাঢ় ১২৯৮ (১২ জুলাই ১৮৯১) সাল)
>
> টাঙ্গাইলের *আহমদী*– আমরা বিশ্বস্ত সুত্রে অবগত হইয়াছি যে, মহামাননীয় বঙ্গধীপ যে সময় ময়মনসিংহে শুভাগমন করেন, টাঙ্গাইল এলাকার কোন মুসলমান জমিদার সহিত লাট বাহাদুরের কথা হয়। আহমদী পত্রিকা সম্বন্ধে লাট বাহাদুর কিছু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন এবং উপস্থিত জমিদার সাহেবকেই আদেশ করেন যে, আহমদী সম্পাদককে সতর্ক করিয়া দিবে যে ভবিষ্যতে কোনরূপ বিরক্তিকর কথা না লিখে। আহমদী এতদিন বন্ধই ছিল-বিগত ১৫ই আশ্বিন রাজভক্ত 'ভারতবাসী ' প্রস্তাব লইয়া প্রকাশ হইয়াছেন। আমরা হৃদয়ের সহিত আহমদীকে গ্রহন করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছি। দয়াময় আহমদীর মঙ্গল করুন।(হিতকরী, ৩০ আশ্বিন ১২৯৮ (১৬ অক্টোবর ১৮৯১) সাল)

ধর্ম-কর্ম যেন মানুষ সুষ্ঠুভাবে করতে পারে সেজন্যই তো প্রার্থনালয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেখা যায় মসজিদ মন্দির নির্মাণ নিয়ে, স্থান নিয়ে গণ্ডগোল। ভারতে হিন্দুদের দ্বারা মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির করার সচিত্র প্রতিবেদন মানুষ দেখেছে। মশাররফ হোসেন তাঁর সময়েরও এমন সংকট মোকাবেলা করেছেন যেন। তাই তিনি লিখেছেন পত্রিকায় : "আমরা গর্বনমেন্ট সমীপে প্রার্থনা করি যে, ভারতে যেখানে অর্থাৎ যে বিভাগে যে খণ্ডে যত মসজিদ, দেবমন্দির, ঈদগাহ প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মের স্থান নির্দিষ্ট আছে, তাহা বিচারপতি কর্তৃক রেজিষ্ট্রারী হউক। নূতন মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য যাহা লিখিতে হইবে তাহাও আদালতে ঘোষণা করিয়া নির্ম্মিত হউক। স্থানের চৌহদ্দী তত্ত্বাবধায়কের নাম ইত্যাদিসহ ঘোষণার দরখাস্ত দিয়া প্রস্তুত হউক। মুদ্রাযন্ত্র

স্থাপিত করিবার সময় যেরূপ ঘোষণার দরখাস্ত দিয়া স্থাপিত করিতে হয়; সেইরূপ ঘোষণা দিয়া নূতন মন্দির মসজিদ ইত্যাদি ধর্ম্মকর্ম্মের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলে কোন পক্ষেরই কোনরূপ সন্দেহের কারণ থাকিবে না। মন্দির, মসজিদের ভান করিয়া সত্য রক্ষার কথাটা যথার্থ ধাম্মির্কের মনে শেলসম বিদ্ধ হয়।"[৬১]

"ভারতবাসী ধর্ম্মভাবে মত্ত, ধর্ম্মোন্মত্ত হৃদয়ে ধর্ম্মের অবমাননা অসহনীয়। কি কবিতে যে কি করিয়া বসে, তাহার দিগ্বিদিগ জ্ঞান কিছুই থাকে না। এমত অবস্থায় প্রজার প্রতি রাজার বিশেষ দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। এই সকল ঘটনার মূল তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া উচিত বিচার করা নিতান্তই কর্তব্য।"[৬২]

রাজনীতি-সচেতন সম্পাদক মীর মশাররফের কয়েকটি বক্তব্য :

> বিলাতী দ্রব্য পরিহার– মাননীয় সহযোগী 'বঙ্গবাসী'র প্রস্তাব আমরা সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। দেশের ছেলে দেশের জিনিসে আদর না করিলে, দেশের জিনিস ভাল না বাসিলে তাহাকে নিমকহারাম ভিন্ন কি বলা যায়? আমরা বিলাতী নামে পাগল। বিলাতী ইদুর ভালবাসী; বিলাতি কুকুর পর্যন্ত কোলে করিয়া তাহার মুখে চুমা নেই। যতদিন আমরা আপন মর্য্যাদা না বুঝিব আপন দেশকে আপন বলিয়া না ভাবিব, ততদিন আমাদের ভাল নাই।"[৬৩]
>
> "আর দিন নাই, আগামী ২৭শে ডিসেম্বর নাগপুরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইবে। ভারত এতদিন নিদ্রিত ছিলেন; আর নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। সমস্ত ভারতবাসীর আভ্যন্তরীণ থাকা একত্রে সমালোচিত হইবে, ভারতের প্রকৃত দুরবস্থা অপনয়নের চেষ্টা হইবে, দূরবাসী ভারত সন্তানগণ একত্রে প্রেমভরে দেখাসাক্ষাৎ করিয়া প্রাণের কথা খুলিয়া বলিবেন, ইহা অপেক্ষা আনন্দের উৎসব আর কি আছে? কংগ্রেস আর কিছু হইল না; ইহাতে লোকের উৎসাহ নাই, ইহাতে পয়সা দরকার, কে দেয়, অনেক ইংরাজ কংগ্রেসকে সুনজরে দেখেন না; দুইজন হুজুগে লোকের হুজুগে কংগ্রেস হইতেছে ইত্যাদি নিরুৎসাহকর নিরানন্দময় চিন্তা যেন এখন কেহই হৃদয়ে স্থান না দেন। প্রত্যেক ভাল বস্তুরই মন্দ সমালোচনা হইতে পারে। যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারা এই মহানুষ্ঠানের উপকারিতা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কংগ্রেস-সহানুভূতিও মনুষ্যত্বের দৃষ্টান্ত। প্রতিনিধিগণ নিজ২ [নিজ নিজ] দায়িত্ব চিন্তা করুন।"[৬৪]
>
> "আমরা মফস্বলের কংগ্রেস সম্বন্ধে যতদূর জানি, তাহাতে প্রতি বৎসরেই দেখিতে পাই, কোথাও কিছু নহে, সারাটি বৎসর কংগ্রেসের নাম নাই। সে সম্বন্ধে অলোচনা কি কোনরূপ আন্দোলন কিছুই নাই। যখন দিন অতি নিকটে হইয়া পড়িল, তাড়াতাড়ি একটা সভা খাড়া করিয়া, প্রতিনিধি নির্বাচনে করা হইল। দেশের লোকে কেহ২ [কেহ কেহ] জানিল, অধিকাংশ লোকে খবরই রাখিল না। যেন একজনকে সাজাইয়া

> নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য পাঠান হইতেছে। ১১টি মাস কংগ্রেসের নাম, শেষ মাসে সময় নাই কি করা, তাড়াতাড়ি সভা করিয়া ২/১ জনকে মনোনীত করিয়া যথাস্থানে পাঠানের উদ্যোগ করিয়া দিয়াই কমিটি দায় হইতে রক্ষা পাইলেন। আমরা মফস্বলের কংগ্রেস কমিটিকে সানুনয়ে বলিতেছি, এখন হইতেই কংগ্রেস কমিটি পূর্ণরূপে গঠন করিয়া, দেশহিতকর বিষয় আলোচনা হইতে থাকুক। ... সত্বরে২ [সত্বরে সত্বরে] মফস্বল কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হওয়া নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। এবারে কলিকাতার কংগ্রেস কমিটি নিতান্তই উচ্চভাবে দাঁড়াইয়াছে। প্রশংসার কথা, আমাদেরই সৌভাগ্যের কথা।"[৬৫]

সংবাদ-সাময়িকপত্র সমাজের দর্পণ, সময়ের দলিল। মীর মশাররফ হোসেনের সম্পাদিত *আজিজন নেহার ও হিতকরী* পত্রিকা দুটি তাঁর সময়ের কথা বলে। বর্তমানে মফস্বল সাংবাদিকতাকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। উন্নয়ন যদি প্রান্ত পর্যন্ত না পৌছায়, তাহলে তা টেকসই হয়না। জৌলুশপূর্ণ, সুবিধাজনক শহুরে সাংবাদিকার রোশনাই জগৎ থেকে অনেক দুরে থেকে, গ্রামবাংলার মানুষের কথাকে যারা তুলে আনেন, সকালের শহুরে নাস্তার টেবিলে সোঁদাগন্ধযুক্ত গ্রামের আঘ্রাণ যারা ছড়িয়ে দেন, সেই মফস্বল সাংবাদিকাতার অন্যতম দিকপাল হিসেবে, বাংলা সাহিত্যের অমর গ্রন্থ *বিষাদ-সিন্ধু*-প্রণেতা মীর মশাররফ হোসেনের নাম আলোচিত হওয়া উচিত।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা :

১. তখন 'সংবাদপ্রভাকরে'র সম্পাদক ছিলেন রামচন্দ্র গুপ্ত–ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ছোট ভাই। সহ-সম্পাদক–ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

২. মীর মশাররফ হোসেন, 'আমার জীবনী', *মশাররফ রচনা-সম্ভার* (পঞ্চম খণ্ড), (কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৯৫

৩. ঐ, পৃ. ২৯৩

৪. আবুল আহসান চৌধুরী, *মীর মশাররফ হোসেন*, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫৭

৫. শামসুজ্জামান খান, 'বিবি কুলসুমের অপ্রকাশিত রোজনামচা' *মীর মশাররফ হোসেন: নতুন তথ্যে নতুন ভাষ্যে*, অবসর, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩৩

৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মীর মশাররফ হোসেন', *সাহিত্য--সাধক-চরিতমালা-২৮-২৯*, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৪৫

৭. 'এডুকেশন গেজেট', ১লা মে, ১৮৭৪/ ১৯ বৈশাখ, ১২৮১; উদ্ধৃত: শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মীর মশাররফ হোসেন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬

৮. সরকারি শিক্ষা বিভাগের পোষকতায় সাপ্তাহিক সংবাদপত্ররূপে 'এডুকেশন গেজেট' প্রথম প্রকাশিত হয় ৪ জুলাই ১৮৫৬ (২২ আষাঢ় ১২৬৩)। প্রতি শুক্রবারে এটি

প্রকাশিত হত। সম্পাদক ছিলেন রেভারেন্ড ও'ব্রায়ান স্মিথ। পরবর্তীকালে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারিচরণ সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সম্পাদনার কাজ করেন।

৯. 'এডুকেশন গেজেট', ৮ মে, ১৮৭৪; উদ্ধৃত: শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মীর মশাররফ হোসেন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬

১০. *সচিত্র সন্ধানী*র সাহিত্য সংখ্যা- ৫, ফাল্গুন, ১৩৮৫–তে শামসুজ্জামান খান এই নতুন তথ্য প্রদান করেছেন। লেখকের *মীর মশাররফ হোসেন : নতুন তথ্যে নতুন ভাষ্যে* বইয়ে প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

১১. শামসুজ্জামান খান, 'স্ত্রী ও পত্রিকার একই নাম– আজীজান নাহার', *মীর মশাররফ হোসেন : নতুন তথ্যে নতুন ভাষ্যে*, অবসর, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৪, পৃ. ৮১-৮২

১২. ঐ, পৃ. ৮২

১৩. ঐ, পৃ.৭৯

১৪. শান্তনু কায়সার, *তৃতীয় মীর*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ২৪

১৫. শামসুজ্জামান খান, *মীর মশাররফ হোসেন : নতুন তথ্যে নতুন ভাষ্যে*, 'স্ত্রী ও পত্রিকার একই নাম– আজীজান নাহার', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

১৬. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মাঘ, ১৪০৭/ ফেব্রুয়ারী, ২০০১, পৃ. ৩৩৩

১৭. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র* (দ্বিতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, আষাঢ় ১৩৯৪/ জুন ১৯৮৭, পৃ. ১১৯

১৮. ঐ, পৃ. ১৫৯

১৯. আবুল আহসান চৌধুরী, *মীর মশাররফ হোসেন*, সূচীপত্র, ঢাকা, জুলাই ২০০৮, পৃ. ৬১

২০. শামসুজ্জামান খান, 'মীর মশাররফ হোসেন : নতুন তথ্যে নতুন ভাষ্যে', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

২১. ঐ, পৃ. ৯২

২২. ঐ, পৃ. ৮২

২৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা', *বঙ্কিম রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ফাল্গুন ১৪০৯, পৃ. ২৪৪

২৪. ঐ, পৃ. ২৪৭

২৫. শামসুজ্জামান খান, 'মীর মশাররফ হোসেন : নতুন তথ্যে নতুন ভাষ্যে', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

২৬. ঐ, পৃ. ৮২

২৭. *সাধারণী*, ২য় ভাগ, ৮সংখ্যা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১/ ৮ জুন ১৮৭৪, পৃ. ৯১-৯২।

২৮. *সাধারণী*, ২য় ভাগ, ১৩ সংখ্যা, ২৯ আষাঢ় ১২৮১/ ১২ জুলাই ১৮৭৪, পৃ. ১৫২।

২৯. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।

৩০. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, 'ভূমিকা', *মশাররফ রচনা-সম্ভার* (তৃতীয় খণ্ড), কাজী আবদুল মান্নান (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৮৪, পৃ. আঠার

৩১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িকপত্র* (দ্বিতীয় খণ্ড), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, আষাঢ় ১৩৫৯, পৃ. ৫৮

৩২. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র* (১৮৩১-১৯৩০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, কার্ত্তিক ১৩৭৬, পৃ. ৪

৩৩. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মাঘ, ১৪০৭/ ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃ. ৩৩৪-৩৫

৩৪. *হিতকরী*, ১৫ বৈশাখ, ১২৯৭/ ২৭ এপ্রিল ১৮৯০, উদ্ধৃত, আবুল আহসান চৌধুরী, *মীর মশাররফ হোসেন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৩৫. *হিতকরী*, ১৫ বৈশাখ ১২৯৭/ ২৭ এপ্রিল ১৮৯০, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৩৬. শামসুজ্জামান খান, *মীর মশাররফ হোসেন: নতুন তথ্যে নতুন ভাষ্যে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৩৭. *হিতকরী*, ১০ বৈশাখ ১২৯৮/ ২২ এপ্রিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৩৮. ঐ

৩৯. ঐ

৪০. ঐ, ৩০ আশ্বিন ১২৯৮/ ১৬ অক্টোবর ১৮৯১

৪১ . আশরাফ সিদ্দিকী, *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৪২. ঐ, পৃ. ১১১

৪৩. আবুল আহসান চৌধুরী, *মীর মশাররফ হোসেন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৪৪. মীর মশাররফ হোসেন, 'বিবি কুলসুম', প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

৪৫. হিতকরী ২য় ভাগ ষষ্ঠ সংখ্যা, পৃ. ৬৯।

৪৬. *হিতকরী*, ২য় ভাগ, ২য় সংখ্যা, ২০ বৈশাখ, ১২৯৮, ২য় পক্ষ শনিবার উদ্ধৃত: শামসুজ্জামান খান, *মীর মশাররফ হোসেন: নতুন তথ্যে নতুন ভাষ্যে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৪৭. হিতকরী, ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৪৮ . হিতকরী, ২ ভাগ ১২ সংখ্যা, ২০ শ্রাবণ, ১২৯৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৪৯. হিতকরী, ২ ভাগ ১৮ সংখ্যা, ৩০ আশ্বিন, ১২৯৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৫০. হিতকরী, ১ ভাগ ৫ সংখ্যা, ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮, প্রাগুক্ত, পৃ.- ৯২

৫১. হিতকরী, ২ ভাগ ১১ সংখ্যা, ২০ শ্রাবণ, ১২৯৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৫২. হিতকরী, ২ ভাগ ৬ সংখ্যা, ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

৫৩. হিতকরী, ২ ভাগ ৬ সংখ্যা,৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮, ১২জুন ১৮৯১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

৫৪. হিতকরী, ২ ভাগ ১৫ সংখ্যা, ৩০ ভাদ্র ১২৯৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

৫৫. হিতকরী, ১ ভাগ ১৬ সংখ্যা, ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৯৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-০২

৫৬. হিতকরী, (দাশহিক), ৩০ শ্রাবণ ১২৯৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

৫৭. হিতকরী, ২ ভাগ ১০ সংখ্যা, শ্রাবণ ১২৯৮, ২৫জুলাই ১৮৯১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-০৪

৫৮. হিতকরী, ৩০ শ্রাবণ ১২৯৮, উদ্ধৃত, আবুল আহসান চৌধুরী, *মীর মশাররফ হোসেন: সাহিত্যকর্ম ও সমাজকর্ম*, ঢাকা, পৃ. ৩৩০

৫৯. হিতকরী, ১৫ পৌষ ১২৯৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০

৬০. হিতকরী, ১৫ আশ্বিন ১২৯৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

৬১. হিতকরী, ১০ আষাঢ় ১২৯৮/ ২৩ জুন ১৮৯১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

৬২. হিতকরী, ১০ আষাঢ় ১২৯৮/ ২৩ জুন ১৮৯১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

৬৩. হিতকরী, ৩০ বৈশাখ ১২৯৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৬৪. হিতকরী, ১০ পৌষ ১২৯৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৬৫. হিতকরী, ১০ ভাদ্র ১২৯৮/ ২৬ আগস্ট ১৮৯১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।